রোমান্স

(গল্পগ্রন্থ – মৌরীফুল)

সমীরই প্রথমে কথাটা তুললে।

তার মত এই যে রোমান্স প্রেম ও-সব নভেলিয়ানা কেবল নভেলেই ঘটে, বাস্তব জীবনে ওদের অস্তিত্ব নেই। তাতে সুধীরও যোগ দিল বলে’ মনে হোল। ক্রমে ক্রমে বাকী সবাই সমীরের মতেই মত দিল। তারপর ক্লাবের বেয়ারা চা দিয়ে গেল। চা খেতে খেতে আমাদের গল্পের ধারা শীঘ্রই এসে টেনিসে পৌঁছলো অন্য সব দিনের মতো।

ঘরের কোণে ব্রিজ-টেবিলের আড়ালে রমেনবাবু এতক্ষণ আলোয়ান মুড়ি দিয়ে আরামকেদারায় টান হয়ে শুয়েছিলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত কোনো তর্কেই তিনি যোগ দেননি, বিশেষ কোনোকথাও বলেননি। চায়ের এক চুমুক খেয়েই একটু তাজা হয়ে নিয়ে বললেন—দ্যাখো, তোমরাএতক্ষণ বকে যাচ্ছিলে আমি শুনছিলাম, কথা কইনি বটে কিন্তু যখন কথাটা উঠেছে তখন বলি শোনো। রোমান্স আছে এবং খুবই আছে। জীবনটাই তো একটা প্রকাণ্ড রোমান্স হে—সে-চোখে দেখে ক’জন—দেখবার চোখই বা আছে ক’জনের?আচ্ছা, চা-টা জুড়িয়ে যাচ্ছে, এস খেয়েনেওয়া যাক্—শোন তারপর বলি...

রমেনবাবু আমাদের ক্লাবের নতুন মেম্বর, মাস চারেক হোল যোগ দিয়েছেন। তাঁকে একটু অদ্ভুত ধরনের লোক বলে আমাদের সকলেরই মনে হয়েছে। ব্রিজ, টেনিস, বিলিয়ার্ড, দাবাকোনো খেলাতেই কোনো দিন তিনি যোগ দেন নি। খুব বেশি মেশামেশি বা গল্পও কখনো তাঁকে করতে দেখা যায় না। আপন মনে এসে বসেন, কাগজপত্র পড়েন, সন্ধ্যার আগেই উঠেচলে যান। কিন্তু লোকটির মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যাতে ক্লাবের সকলে তাঁকে খুবপছন্দ করে। তিনি না এলে, কেন তিনি এলেন না সে সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং আর একটাজিনিস, যা আদৌ ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক নয়, সেটা এই যে তিনি উঠে চলে গেলে তাঁর পেছনে তাঁর সম্বন্ধে মন্দ কথা কেউ কোনো দিন বলতো না।

ইতিমধ্যে চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছলো। রমেনবাবু চা পান শেষ করে রুমালে মুখমুছেগল্প শুরু করলেন—

বছর কয়েক আগে আমি তখন একটা স্বদেশী ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রি ও প্রচারের কার্যেঢাকা যাই। সেই প্রথম ও-অঞ্চলে যাওয়া। সময়টা শীতের শেষ হলেও কলকাতার ধারণায় আমি শীতের কাপড় সঙ্গে নিয়ে যাইনি বলে একদফা পদ্মার স্টীমারে, তারপর ট্রেনে শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে রাত সাড়ে ন’টা দশটার সময় গিয়ে ঢাকায় পৌঁছলাম। আমাদের ব্যাঙ্কেরএকজন ডিরেক্টার ঢাকা শহরের এক ভদ্রলোকের নামে একখানা পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন। তিনিশহরের একজন বড় উকীল—নাম এখানে করবার আবশ্যক নেই—তাঁরই বাসায় গিয়ে উঠবো এরকম কথা ছিল।

আমি যখন সে বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম তখন রাত সাড়ে দশটার কম নয়। বেশ জ্যোৎস্নারাত, কম্পাউণ্ডের বাঁ ধারে ফুল-বাগান, জাফরিতে মাধবীলতা এঁকে-বেঁকে উঠেছে—আলো-আঁধারে পাতার আড়ালে বড় বড় ব্ল্যাকপ্রিন্স গোলাপ ফুটে রয়েছে—এসব গাড়িতে বসেই কৌতূহলেরসঙ্গে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। গাড়ি থামতেই একজন হিন্দুস্থানী দারোয়ান রুটি সেঁকা ফেলেগাড়ির কাছে এসে সেলাম করে দাঁড়াল। তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম উকীলবাবু কি কাজে কুমিল্লাতে গেছেন, আজ তিন চারদিন বাড়ি ছাড়া, কবে আসবেন তার ঠিক নেই।কোচম্যানকে গাড়ি ফেরাতে বলেছি—ডাকবাংলোতেই অগত্যা উঠবো—একটি ছেলে বাড়িরমধ্যে থেকে বার হয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে সেই দারোয়ানটিও এল—সে যে ইতিমধ্যে কখন বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল আমি লক্ষ্য করিনি। ছেলেটি বললে—বাবা কাল সকালেই আসবেন, আপনিযাবেন না—শুনলে বাবা দুঃখ করবেন। রামদীন, বাবুর জিনিসপত্র নামিয়ে নাও।

সুতরাং র’য়ে গেলাম। আহার ও শয়নের ব্যবস্থা সুন্দর হোল, সারাদিনের পরিশ্রমে শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে উঠে বাইরের বারান্দাতে বসে’ কাগজ পড়ছি, গৃহস্বামীর গাড়ি সদর গেট দিয়ে কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকলো। আজ সকালের ট্রেনেই উকীলবাবুর আসবার কথা ছিল—তাইতাঁর গাড়ি স্টেশনে গিয়েছিল তাঁকে আনতে। গৃহস্বামী গাড়ি থেকে আমায় দেখে নেমে আমারপরিচয় জেনে খুব খুশী হলেন। নানাভাবে আপ্যায়িত করলেন, রাত্রে কোন কষ্ট হয়েছে কিনা সেকথাটা অন্ততঃ দশবার এমনভাবে জিজ্ঞাসা করলেন যে মনে হোল রাত্রে কষ্ট হয়নি বললে তাঁকে হতাশ করা হবে। একদিনের মধ্যে আমি যেন বাড়ির লোক হয়ে পড়লাম সে বাড়িতে। রাত্রে আমার আহারের স্থান হোল বাড়ির মধ্যের দাওয়ায়। পরদিন সকালে আমার বাইরেরঘরে একটি বারো-তেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে চা ও খাবার নিয়ে এল। বেশ ডাগর-ডাগর চোখ,

কালো চুলের রাশ পিঠের ওপর পড়েছে, মুখ দেখে বুদ্ধিমতী মনে হয়। চা ও খাবারের পাত্রটা টেবিলের ওপর রেখে সে চলে’ যাচ্ছিল, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি বুঝি খুকীএ-বাড়িরই না?নাম কি তোমার?

সে হেসে বললে—বীণা।

তারপরই সে চলে’ গেল।

পরের দিন সকালে সেই মেয়েটিই আবার চা নিয়ে এল। এ-দিন সে অত শীঘ্র চলে’ গেলনা।তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি বুঝি স্কুলে পড়—না?

সে বললে—আমি মিডফোর্ড গার্লস স্কুলে পড়ি।

—কোন্ ক্লাসে পড়?

—এবারে ফোর্থ ক্লাসে উঠেছি এই জানুয়ারী মাসে...

—কি কি বই পড়?

কিছুক্ষণ ধরে’ আমাদের কথাবার্তার ধারা ওই পথ ধরেই বেয়ে চললো।

বিকালে সে আপনিই আবার এল। আমার ঘরের চেয়ারটার হাতলের ওপরে বসলো।বলল—আপনি বুঝি বই লেখেন?

—কি করে’ জানলে বল দেখি?

—আপনার নাম দেখেছি, আমাদের বাড়িতে মাসিকপত্র আসে, তাতে আছে...

—কই কোন্ মাসিকপত্র, আনো তো দেখি।

বীণা দু’তিনখানা মাসিকপত্র নিয়ে এল।

একটাতে আমার “বিদেশী ব্যাঙ্ক ও আমাদের কর্তব্য” বলে একটা অর্থনৈতিক প্রবন্ধ বারহয়েছিল বটে; সেইটা বীণা খানিকক্ষণ ধরে পড়লো। তারপর সেটা মুড়ে রেখে এ-গল্প ও-গল্পকরতে লাগলো। আমি মুখে মুখে ট্রান্‌স্লেশন্ জিজ্ঞাসা করলাম—সবগুলোর উত্তর দিলে। ঢাকামিউজিয়াম দেখতে যাবার ইচ্ছা ছিল। বিকালটায় কিন্তু বীণা অনেকক্ষণ ধরে’ ঘরে বসেরইলো— মিউজিয়াম দেখতে না যাওয়া হলেও কোনো ক্ষতি অনুভব করলাম না।

শেষরাত্রে কি জন্যে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, কানে গেল বাড়ির মধ্যে মেয়েলি গলায় কেচেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ইউক্লিডের জিওমেট্রি পড়ছে—Two tangents can be drawn to a circle from an external point and they are equal and also subtend—।ভারী আশ্চর্যলাগলো। বীণা নিশ্চয়ই নয়—কারণ ফোর্থক্লাসে জিওমেট্রির ট্যানজেন্ট কোনো স্কুলেই পড়ানোহয় না—তা ছাড়া সেটা বীণার গলাও নয়। ঘড়িতে দেখলাম রাত চারটে বেজেছে। মনে মনে ইউক্লিডের অপূর্ব প্রভাবকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারলাম না। এই শীতের রাত্রে চারটেরসময় কার জ্ঞান-পিপাসা এত প্রবল হয়ে উঠেছে জানবার ভারী ইচ্ছা হোল।

সকালে বীণা চা নিয়ে আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম—বীণা, শেষরাত্রে কে জিওমেট্রি পড়ছিল বাড়ির মধ্যে—তুমি?

বীণা হেসে বললে—আমি না, ও দিদি—এইবার ম্যাট্রিক দেবে। এই সামনের বুধবার থেকেএগ্‌জামিন বসবে কিনা।

আমি বললাম—কই, তোমার দিদি ম্যাট্রিক দিচ্ছেন সে-কথা তো শুনিনি? স্কুলের গাড়িতেতো তুমিই একলা যাও দেখেছি...

বীণা হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। বললে—বা রে, বেশ লোক তো আপনি। দিদি তোএ্যালাউ হয়ে বাড়ি বসে পড়ছে—ও বুঝি আমার সঙ্গে রোজ রোজ স্কুলের গাড়িতে পড়তে যাবে?

কথাটা বীণা ঠিকই বলেছে, তার হাসিটা নিতান্ত অসঙ্গত নয় বটে।

সেদিন বিকালে স্কুলের গাড়িটা যখন এসে লাগলো তখন আমি রোয়াকে পায়চারি করছিলাম। বীণাকে নামতে দেখলাম না কিন্তু আর একটি মেয়ে নামলো। বয়স পনরো-ষোলহবে, অপূর্ব সুন্দরী, লাল পাড় সিল্কের

জ্যাকেটের বাইরে নিটোল শুভ্র বাহুদুটি যেন হাতীরদাঁতে কুঁদে তৈরী। একবার আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখে শান্তগতিতে বাড়ির মধ্যেঢুকলো।

সন্ধ্যার একটু আগে বীণা এসে বললে—চা এখন আনবো, না বেড়িয়ে এসে খাবেন?...পরেএকটু থেমে বললে—দিদিকে আজ দেখেছেন, না?

আমি তখনও ঠিক করতে পারিনি যে স্কুলের গাড়ির সেই মেয়েটিই বীণার দিদি। পূর্বেইবলেছি বীণা ভারী বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে আমার মুখ দেখেই ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বললে—আজ বিকালে স্কুলের গাড়ি থেকে যে নামলো তখন ঐ তো দিদি—আমি তো আজ স্কুলে যাইনি।দিদি রিসিট আনতে স্কুলে গেছলো যে, ও-বেলা...

পরে সে বললে—দিদিই আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, বাইরের ঘরে ও-ভদ্রলোকটি কেরে?

মনে মনে অভিমানে বড় ঘা লাগলো। বড়-মানুষের মেয়ে বটে, সুন্দরীও বটে, কিন্তুআজ ছ'সাতদিন যে আমি তাঁর বাপের বৈঠকখানার একখানা চেয়ার টেবিলের মতো বাইরেরঘরের এক কোণে পড়ে' আছি, এতদিনের মধ্যে এ হতভাগ্যের সম্বন্ধে সে সংবাদটুকুও কি তাঁরকর্ণগোচর হয়নি?

দিন দুই কেটে গেল। এ কয়দিনে আমি নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে যথেষ্ট ঘোরাঘুরি করলাম, তাতে ঠিক সময়ে স্নানাহার হয়ে উঠতো না কোনো দিনও। সুতরাং বীণার সঙ্গে দেখা হবার সময় হোত না। তৃতীয় দিন সকালে বার হয়ে সন্ধ্যার কিছু আগে ফিরে এলাম। বারান্দাটাতেবসে একটু বিশ্রাম করছি, অপ্রত্যাশিতভাবে বীণা ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বললে—ঠাকুর দু'বার, তারপর আমি দু'বার আপনাকে ডাকতে এসে ফিরে গিয়েছি—আপনার খিদেতেষ্টা কিছুই পায়না, কোথায় ছিলেন সারা দিনটা?

আমি কৈফিয়ত দেবার আগেই সে আবার বলে উঠলো—মুখ হাত ধুয়ে ফেলুন, আপনার চা নিয়ে আসি—বাবা এখনও কাছারি থেকে ফেরেননি, গরম জল চড়ানই আছে...

অল্প পরেই সে চা নিয়ে এসে অভ্যস্ত ভাবে সামনের চেয়ারের হাতলটার ওপর বসেঅনর্গল বকে যেতে লাগলো—সব কথার উত্তর পাবারও প্রত্যাশা সে রাখে না। আপনা আপনিইবেশ বলে যেতে পারে। বললে—ভারী মজা হয়েছে, আমি আপনার একটা লেখা দিদিকে দেখিয়েবললুম—পড়ে দেখো তো। দিদি পড়তে গিয়ে বুঝতে পারে না—দাঁড়ান সেখানা আনি...

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে বাড়ির মধ্যে চলে গেল, কিন্তু সেদিন আর সে বাইরের ঘরে দেখা দিলে না। বীণার খামখেয়ালি ধরন আমার জানা ছিল, কাজেই এতে আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য হলাম না। পরদিন সকালে সে এল—হাতে একখানা "বঙ্গ-বন্ধু"।আমায় দেখিয়ে বললে—এই নিন, দিন দিকি বুঝিয়ে?লাল পেন্সিলে দিদি দাগদিয়ে দিয়েছে জায়গাগুলো।সেই মাসের "বঙ্গ-বন্ধু"তে আমার "যৌথ-ব্যাঙ্ক ও মধ্যবিত্তের কর্তব্য" বলে প্রবন্ধটা বেরিয়েছিল। হাতে নিয়ে মনে মনে ভাবলাম, যদি ম্যাট্রিক ক্লাসের একটি মেয়েকেও তাক লাগিয়ে না দিতে পারলাম তবে অনবরত দিন-পনরো ধ'রে ইম্পিরীয়ালরী লাইব্রেরী যাতায়াত এবং নানান Year-Book নাড়া-চাড়া করবার সার্থকতা আর কি হোল?

বীণা বিকেল বেলা একখানা খাতা হাতে নিয়ে এসে বললে—চা-টা খেয়ে নিন—নিয়ে দিদির এই ট্রান্‌স্লেশন্‌টা হয়েছে কিনা দেখে দিন তো।দিদি বললে আপনাকে দেখাতে...

সেটা হাতে নিয়ে দেখলাম—বেশ গোটা গোটা মুক্তোর ছাঁদের লেখাটা বটে কিন্তু ট্রান্‌স্লেশন্‌টা বিশেষ উঁচুদেরের নয়। কাজেই যখন বীণা বললে—ধরুন কুড়ি নম্বর আছে, কত নম্বর দেবেন আপনি? তখন একটু আমতা আমতা করে বললাম—নম্বর? তা এই ধরো, অবিশ্যি বাংলাটা খুব শক্ত, তা ধরো এই চার কি পাঁচ দিতে পারি...

—মোটে? তবেই হয়েছে, দিদি তাহলে এবার ইংরিজিতে ফেল, ফেলতুঃ, ফেলু—কথাটা শেষ করেই সে মুখে হাতখানা চাপা দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠলো।আমি একটু অপ্রতিভ হয়ে বললাম—না না, ফেল কেন হবেন—আর একটা সোজা দেখে করলেই—এটা বেজায় শক্ত কিনা?

বিকেলে এসে বীণা বললে—দিদি বলে দিলে আপনাকে রোজ রোজ তার ট্রান্‌স্লেশন্ দেখে দিতে হবে—পারবেন তো?

—খুব খুব—নিয়ে এসো না কাল থেকে।কেন দেখে দেবো না?

সেদিন থেকে আমার কাজ হোল রোজ রোজ একরাশ করে ইংরাজি ও বানানের ভুল সংশোধন করা। বেশ হাতের লেখাটি কিন্তু—খাতার শেষে গোটা গোটা ছাঁদে আমার নেপথ্যপথবর্তিনী ছাত্রটির নাম লেখা থাকে—প্রতিমা দেবী।

কয়েকদিন খুব গুমটের পর বৈকালের দিকে সেদিন খুব বৃষ্টি হোল। উকীলবাবুর বাড়ির সামনে একটা বড় বটগাছে নতুন পাতা গজিয়েছে, বারান্দাটাতে বসে' সেদিকে চেয়ে আমি আমার দেশের বাড়ির কথা ভাবছিলাম—কত দিন যাইনি, কাজের খাতিরে বিদেশে বিদেশে বেড়াতে হয়। তবুও যখন নববর্ষ নামে, বৃষ্টি-সজল বাতাসে এখান থেকে তিনশো মাইল দূরের সে গ্রামখানির ভিজে মাটির গন্ধ যেন ভাসিয়ে আনে...মনে হয় আমার ছোট ভাই অন্তু হয়ত এতক্ষণ আমাদের উঠানে বৃষ্টির জলে কাগজের নৌকো ভাসিয়ে খেলা করছে।...গোঁসাই কাকাদের বৈঠকখানাতে এতক্ষণ তাসের খুব মজলিস বসেছে...তখন মন বড় খারাপ হয়ে যায়, ইচ্ছা হয় চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়ি গিয়ে উঠি।

উকীলবাবু কয়েকদিন রক্তাধিক্যের অসুখ হওয়ায় বাড়ির মধ্যেই ছিলেন, কাছারিও যাননি। তিনি ঝড়-বৃষ্টি থামবার পরে বারান্দাতে এসে আমার পাশে একটা আরাম-কেদারায় বসে নানা গল্প করতে লাগলেন। বেশ অমায়িক স্বভাবের ভদ্রলোকটি। বললেন—ক'দিন আপনার খোঁজখবর করতে পারিনি, কোনো অসুবিধে হয়নি আপনার? হ্যাঁ দেখুন, বীণা বলছিল আপনি প্রতিমার ট্রান্স্লেশন্ রোজ দেখে দেন—কি রকম বুঝছেন, পাস-টাস করবে? ইংরিজিটা তেমন জানে না, যদি কিছু না মনে করেন তবে আপনাকে একটু অনুরোধ করি মেয়েটিকে একটু করে দেখবেন আপনার সময়মত? শুধু ইংরিজিটা দেখে দিলেই—ওর মাস্টার ছিল, হঠাৎ মা মারা যাওয়াতে বেচারী জানুয়ারী মাসে বাড়ি চলে গেল আর এল না—অবিশ্যি যদি আপনার...

বলা বাহুল্য আমাকে এ-বিষয়ে রাজী করাতে তাঁর যতটা বাক্য ব্যয় করার প্রয়োজন ছিল, তিনি তার চেয়ে যেন একটু বেশীই করলেন।

তারপর দিন-দুই কেটে গেল। প্রতিমা রোজ বিকেলে নয় দুপুরে খাতা নিয়ে এসে বসে, সঙ্গে থাকে বীণা। কোন কোন দিন সেও থাকে না। ধরনটি ওর ভারি মিষ্টি অথচ ওর মধ্যে এমন একটা স্বাভাবিক গাম্ভীর্য আছে যা অবাধ পরিচয়ের পথে একটা সহজ ব্যবধানের সৃষ্টিকরে।

সেদিন প্রতিমা এসে সামনের চেয়ারখানাতে বসলো। ট্রান্স্লেশন্ দেবার পরে সে মুখ নিচু করে হেসে বললে—এ আমি পারবো না—এটা বদলে দিন...

আমি বললাম—এমন আর শক্ত কি, করে' দেখবে এখন সোজা...

সে পুনরায় ঠিক সেই ভাবে হেসে বললে—না আমি পারবো না, আপনি বদলে দিন...

যে সুরে সে কথাটা বললে, সেটা অতি শান্ত মৃদু হলেও মনে হোল এর পর আর তর্ক চলে না। বদলে দিলাম বটে কিন্তু ভাবলাম মেয়েটি একটু একরোখা ধরনের।

পড়াশুনা শেষ করেই প্রতিমা খাতাপত্র উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। একটু পরে বিকেলের দিকে আবার খুব ঝড়বৃষ্টি নামলো—এ অবস্থায় বাইরে বেড়াতে যাওয়া উচিত হবে না বুঝে চুপ করে বারান্দায় আরাম-কেদারাটাতে বসে আছি—পেছনে দোর খোলার শব্দ হোল। চেয়ে দেখি আগে আগে বীণা, পেছনে প্রতিমা ঘরে ঢুকছে। প্রতিমার আগমন অনেকটা অপ্রত্যাশিত—কারণ এক পড়াশোনার সময়টি ছাড়া প্রতিমা অন্য কোন সময়ে আমার এখানে আসেনি কখনো।

বীণা ঘরে ঢুকেই বললে—কেমন বৃষ্টি নেমেছে মাস্টার-মশায়!

—এসো এসো! ভিজতে ভিজতে এলে যে?

—দিদি বললে আপনি একলাটি বসে আছেন তাই চল গিয়ে গল্প...

প্রতিমা তার দিকে ভ্রূকুটি ক'রে বললে—আমি?

পূর্বে ও-কথাটা মনে হয়েছে এখনও মনে হোল, প্রতিমা যে সুন্দরী তার ব্লাউজের হাতার লাল সিল্কের পাড়ের সঙ্গে সুন্দর খাপখাওয়া শুভ্র বাহু দুটির নিটোল গঠনের দিকে চেয়ে একথা মনে মনে অস্বীকার করতে পারলাম না। কিন্তু সকলের চেয়ে অদ্ভুত তার দুটি চোখ ও ভুরু দুটির একটা বিশেষ ভঙ্গি। সেটা কি তা ঠিক

মুখে বোঝানো যায় না অথচ যে ধরনের সৌন্দর্যে মনের মধ্যে একটা অব্যক্ত অভাবের বেদনা সৃষ্টি করে ওর মুখের সৌন্দর্যটা ঠিক সেই ধরনের।

প্রতিমা বললে—একলা বসে থাকতে আপনার খুব ভালো লাগে, না? বসে বসে লেখেন বুঝি? উঃ, কি শক্ত লেখাই লিখেছেন--আচ্ছা অত পার্সেন্টেজ গ্রাফ, সেন্সাস রিপোর্ট কোথায় পেলেন—সব বুঝি আপনার মুখস্থ?

—মুখস্থ কি আর থাকে। ও-সব লাইব্রেরীতে গিয়ে বই দেখে লেখা—অত মুখস্থ থাকলে একটা সচল Year Book হয়ে উঠবো যে...

—আচ্ছা আপনার দেশ কোথায়?

—অনেক দূর, বর্ধমান জেলায়। তোমার জিওগ্রাফি আছে ম্যাট্রিকে?

প্রতিমা মৃদু হেসে বললে—জিওগ্রাফি না থাকলেও বর্ধমান জেলা জানি...

বীণা বলল—আমাদের ক্লাসের জিওগ্রাফিতে বর্ধমান জেলার কথা আছে। আচ্ছা, আপনাদের দেশে খুব ধান হয় আর খুব কয়লার খনি আছে, না মাস্টার-মশায়?

—কয়লার খনি নেই এমন নয়, তবে একটু পশ্চিম ঘেঁষে....

প্রতিমা বললে—কয়লার খনি দেখেছেন আপনি? আচ্ছা ও কি করে হয়?

কয়লার খনির উৎপত্তির কথা এসে পড়াতে স্বভাবতঃই অনেক কথা মনে পড়লো। পৃথিবীর আদিম জন্মকথা, নেবুলা, স্তর বিভাগ, বিভিন্ন যুগবিভাগ, সূর্য ও প্রাণীর জন্মের ইতিহাস, জীবাত্মা ও অধুনালুপ্ত অতিকায় জীবদিগের বিবরণ ইত্যাদি।একদিকে প্রতিমার সৌন্দর্য অন্যদিকে এ-সব মহিমাময় বৈজ্ঞানিক রোমান্স, যেন একদিকে শাশ্বতী নারীর কমনীয়তা অন্যদিকে পুরুষের বিশাল প্রসারতা ও উদার কল্পনার প্রতীক।

প্রতিমা খুব মন দিয়ে শুনছিল এবং মাঝে মাঝে এ-প্রশ্ন ও-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিল! শেষ হয়ে গেলে বললে—আমি এ-সব কথা শুনিনি তো কোন দিন—স্কুলে কেউ তো বলে না।

ওরা চলে' গেল। বাইরে গিয়েই প্রতিমা বীণার দিকে চেয়ে নিচু গলায় শাসনের সুরে বলছে কানে গেল—ও-রকম মাস্টার-মশাই মাস্টার-মশাই বলছিলি কেন বীণা? ভারি খারাপ শোনাচ্ছিল কানে—উনি কি আমাদের মাইনে নিয়ে পড়ান?

কয়েকদিন পরে হঠাৎ আমি কলিকাতায় ফেরবার জরুরী তার পেলাম অফিস থেকে। পরদিন সকালে বিছানাপত্র বাঁধা-ছাঁদা চলছে, বীণা এসে বললে—আপনার আজ যাওয়া হবে না। বেশ তো আপনি, ভরা অমাবস্যা মাথায় বুঝি বাড়ি থেকে বেরুতে আছে?দিদি বলে' দিলে মাস্টার—এই রমেনবাবুকে বারণ করে' আয় কাল যাবেন এখন। খুলুন বিছানা—ধরবো?

সেদিন অমাবস্যা কাটবার কথা ছিল না, সুতরাং বিছানাপত্র আবার খুলতে হোল।

পরদিন সকালে এক কাণ্ড ঘটলো। দশটার গাড়িতে আমি যাবো, উকীলবাবুও আমার সঙ্গে যাবেন তাঁর কি কাজে ফরিদপুরে। নারায়ণগঞ্জ থেকে এক স্টীমারেই আমরা যাবো।সকালে দু'জনে একসঙ্গে মাঝের বারান্দাতে খেতে বসেছি, হঠাৎ উকীলবাবু প্রতিমার ওপর রেগে উঠলেন। আজকের রান্নাবান্নার ভার তারই ওপর বুঝি উকীলবাবু দিয়েছিলেন। সে একটু বেলায় আরম্ভ করিয়েছে ঠাকুরকে দিয়ে, এই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে—বিশেষ করে আমি সেখানে একজন বাইরের লোক—আমার সামনে মেয়েকে এমন রূঢ় ও অপ্রীতিকর কথাবার্তা বললেন, যাতে করে আমি অত্যন্ত সঙ্কোচবোধ করলাম। আমার দিকে চেয়ে তিনি বলতে লাগলেন—দেখলেন রমেনবাবু, আজকালকার মেয়েদের—আমি ওকে কাল রাত থেকে বলছি, সকালে আমরা যাবো সব যেন ঠিক থাকে—দেখছেন তো একবার কাণ্ডখানা? বলি এটা কি ঝোল না কি ছাই এটা? এর নাম ঝোল? না, আমি সত্যি বলছি রমেনবাবু, আমি আজকালকার ও-সব বিবি সাজা পছন্দ করিনে একেবারেই। খুব হয়েছে পড়াশুনোর আর দরকার নেই, যথেষ্ট হয়েছে...

আমার সামনে এ-সব কথা হওয়াতে হয়তো নেপথ্যপথবর্তিনী প্রতিমা লজ্জায় অপমানে ভেঙে পড়তে চাইছিল। কেন না আমি সম্পূর্ণ বাইরের লোক। তিরস্কারের পর সে আর আমাদের। সামনে পরিবেশন করতে বেরুলো না। অত্যন্ত ভারী মন নিয়ে ঘরটিতে ফিরে এলাম।

একটু পরই বীণা চায়ের কাপে এক কাপ দুধ নিয়ে এসে বললে—দুধ-মিছরি খেয়ে নিন্—

—দুধ মিছরি, কেন বলো দেখি?

—আমাদের বাড়িতে নিয়ম আছে, বাড়ি ছেড়ে কেউ কোথাও যাবার সময় তাঁকে দুধ-মিছরি খেতে দিতে হয়। ওপরের ঘরে বাবাকে দিয়ে এলাম। দিদি বলে দিলে—রমেনবাবুকেও দিয়ে আয় বাইরের ঘরে....

গত তিন দিন প্রতিমার সঙ্গে দেখা হয় নি। আজ এই মাত্র এই যা খাবার সময় দেখা হয়েছিল, তাও অতি অল্পক্ষণের জন্যে। যাবার সময়ও দেখা হোল না—শুধু বীণা বিছানাপত্র গাড়িতে ওঠাবার সময় কাছে কাছে ছিল। আমার মনে কয়েকদিন ধরে একটা সন্দেহ হয়েছিল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম—বীণা, আচ্ছা একটা কথা বলি, তোমার মাকে তো দেখতে পাইনি কোনোদিন। তিনি...

—আ্যমার মা এক মাস হোল মামার বাড়ি গিয়েছেন ছোটমামার বিয়েতে—এই বুধবার আসবেন। আর দিদির মা নেই, দিদির ছেলেবেলাতেই...

—প্রতিমা তোমার আপন বোন না?

বীণা ঘাড় নেড়ে হেসে বললে—বা রে, আদ্দিন আছেন, তাও জানেন না বুঝি? আপনার মন থাকে কোথায়?একদিন তো আপনার সামনে এ কথা হয়ে গিয়েছে না?

কবে পূর্বে একথা উত্থাপিত হয়েছিল, মনে না হোলেও এতদিনের একটা খটকা আমার কাছে আজ পরিষ্কার হয়ে গেল। তাই বীণা ও প্রতিমার মুখের গড়নে এতখানি তফাত! কথাটা অনেক বার মনে হোলেও ঠিক কিছু ধারণা করতে পারিনি এত দিন।

অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে উকীলবাবুর সঙ্গে তাঁর গাড়িতে উঠে বসলাম। আজ কয়দিনের তো জানাশোনা—কিন্তু চলে' যাবার সময় মনে হতে লাগলো, প্রথম এসে এই অপরিচিত লোহার গেটের মধ্যে যখন আমার ঠিকাগাড়ি ঢুকেছিল, সেদিন আজ অনেকদূর পেছনে পড়ে গিয়েছে— আজ এই বাড়ির প্রতি জিনিসটা, ঐ পাতা-বাহারের গাছটা, বাইরের উঠানের ঐ পুরানো ইঁদারাটা, সব যেন হঠাৎ বড় প্রিয় হয়ে উঠেছে—যেন নীড়-হারা বিহঙ্গ নিঃসীম শূন্যে মুক্তপক্ষে উড়তে উড়তে কোথায় নীড়ের সন্ধান পেয়েছিল, যে নীড়ে তার কোন দাবীদাওয়া নেই, শুধু মনের মধ্যেকার একটা অনির্দিষ্ট নির্ভরতার ভাবে সেই মিথ্যা অধিকারের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিত মাত্র।তাই আজ ছেড়ে যাবার বাস্তবতার সঙ্গে দ্বন্দ্বে তার নিজের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। যে সে অধিকারের বার্তাটা কতটা অসঙ্গত ও ভিত্তিশূন্য।

দেশে ফিরে অল্প কিছুদিন বাড়ি থাকবার পরেই কয়েক মাস একরকম কেটে গেল। পূজার পরে কার্তিক মাসের প্রথমে হঠাৎ অফিসের হুকুম হোল আবার ঢাকা যাবার।

এবার যখন গোয়ালন্দ থেকে স্টীমারে উঠলাম তখন আগেকার মত ভিড় ছিল না। পদ্মাবক্ষ শান্ত স্থির—চরে চরে কাশের বন ঘন সবুজ, আকাশের রঙ তিসির ফুলের মত নীল।নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত ভারী আরামে কাটলো।

ঢাকায় নেমে কিন্তু বীণাদের ওখানে না গিয়ে ডাকবাংলোয় উঠলাম।

নানা কারণে এবার বীণাদের বাড়ি উঠতে পারা গেল না। বার বার অনাহূত ভাবে তাদের ওখানে গিয়ে উঠলে তারাই বা কি মনে করবে? হয়তো এবার আমার সেখানে যাওয়াটা তারা পছন্দ নাও করতে পারে। তার চেয়ে বরং নিজের কাজকর্ম সেরে এমনি একদিন তাদের বাড়িতে গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখাশুনা করে' আসা যাবে এখন।

আবার জ্যোৎস্না-পক্ষ ঘুরে এল। ডাকবাংলোর কম্পাউণ্ডের হাস্না-ঝোপের মিঠা মৃদু সৌরভ-ভরা ঝিরঝিরে বাতাসে বারান্দার রেলিঙ-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত কথাই মনে ওঠে। একবার মনে হচ্ছিল, এই অপরিচিত ঢাকা শহরটিতে এমন কেউ আমার আপনার জন আছে যে, যদি সে জানে আমি ঢাকাতে এসেছি এবং লক্ষ্মীছাড়ার মতো ডাকবাংলোয় উঠে দাড়িওয়ালা বাবুর্চির শিরাবহুল হস্তের ডালভাত ও সুরুয়া আহার করছি তো মনে মনে ভারী দুঃখিত হবে। কারণ আমি জানি আমার আহারের কিছুমাত্র অনিয়ম হোলে তার সহ্য হয় নি, নানা অনুযোগ করে ঠিক সময়ে খেতে বাধ্য করেছে, কিসে আমার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে তার জন্যে অলক্ষ্যে কত চেষ্টা ছিল তার। এক একবার মনে হচ্ছিল, এসব চিন্তার সার্থকতা কি? অতিথির প্রতি সৌজন্যকে অন্য কিছু বলে মনে করবার অধিকারই বা আমায় কে দিয়েছে?

দিন পনেরো ঢাকায় কেটে গেলেও বীণাদের বাড়ির রাস্তা পর্যন্ত মাড়ালাম না ইচ্ছে করেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুধু “ভারতমাতা ব্যাঙ্কের” শেয়ার বিক্রি এবং কালু-ঝম্‌ঝম্‌ তোপের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করে সময় কাটানো অসম্ভব ও একঘেয়ে হয়ে উঠলো।একদিন বিকেলের দিকে ওদের বাড়িতে ছড়ি—হাতে নিশ্চিন্তমনে বেড়াতে গেলাম—যেন এই পথ দিয়েই কাজের খাতিরে যেতে যেতে একবার দেখতে আসা গেল কে কেমন আছে। গেটের মধ্যে ঢুকে চোখে পড়লো বাড়ির ওপরের ঘরে সব জানালা বন্ধ। উকীলবাবুর অফিস-ঘরের সামনে রামধুনিয়া বেয়ারাও টুলের ওপর বসে নেই, বাইরে কোথাও একটা—কি করা যায় বা কাকে ডাকবো ভাবছি এমন সময় উকীলবাবুর পুরানো খানসামা ছকু বাজার থেকে কি কিনে নিয়ে গেট দিয়ে বাড়ি ঢুকেই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

—বাবু আপনি?

—হ্যাঁ, এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই। বাবু কোথায়?

—আপনি শোনেন নি, জানেন না কিছু?

পরে সে একে একে যা বলে গেল তা সংক্ষেপে এই যে, গত ভাদ্রমাসে উকীলবাবু রক্তাধিক্য রোগে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা যান। তার ওপর বিপদ—বড় দিদিমণি পরীক্ষায় ফেল হন এবং তারপরই তাঁর মাথা খারাপ মত হয়ে গিয়েছে—তিনি আছেন তাঁর মামার বাড়ি। বীণাকে নিয়ে তাঁর মা নিজের বাপের বাড়ি চলে গিয়েছেন এবং সেইখানেই আছেন।বর্তমানে এ-বাড়িতে রঘু মিশির দারোয়ান আর সে ছাড়া আর কেউ থাকে না, অন্য চাকর-বাকরের জবাব হয়ে গিয়েছে।

ডাকবাংলোয় ফিরে সেদিন কোনো কাজে মন গেল না। প্রতিমার কথা ভেবে আমার মন করুণায় পূর্ণ হয়ে গেল। ডাকবাংলোয় নির্জন বারান্দার অন্ধকারটাও যেন অশ্রুসজল হয়ে উঠলো ওর নানা ছোটখাট কথাবার্তার স্মৃতিতে...পরদিন সকালে আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রির কাজটা যে পরিমাণে হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি। সকাল-সন্ধ্যায় সব সময় মহা উৎসাহে ঘুরে ঘুরে অফিসের কাজ করে বেড়াই আর কলকাতার অফিসে বড় বড় রিপোর্ট পাঠাই।

দিন পাঁচেক পরে সেদিন সকালে স্নান করে বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছি এমন সময় ডাকবাংলোর বেয়ারা বললে—আপ্‌কো পাস এক আদমি আনে মাংতা হ্যায়...

একটু পরেই দেখি উকীলবাবুর বাসার ছকু খানসামা বেয়ারার সঙ্গে ঘরে ঢুকছে। আমি আগ্রহের সুরে বললাম—কি মনে করে?

ছকু বললে—পরশু ছোটদিদিমণি বাড়ি এসেছেন মার সঙ্গে। আপনি সেদিন বাসায় গিয়েছিলেন শুনে আমায় বলে দিলেন, ডাকবাংলোয় গিয়ে দেখে আয় তিনি আছেন কিনা, থাকলে আমাদের বাড়ি অবিশ্যি করে একবার আসতে বলে’ আয় আমার নাম করে’—আজই বিকেলে যেতে বলে দিয়েছেন।

আমি তাকে বলে দিলাম, অফিসের কাজ সেরে বিকেলের দিকে আমি নিশ্চয়ই যাবো।

বিকেলে যখন বীণাদের বাড়ি গেলাম তখন সন্ধ্যা হবার খুব বেশি দেরি ছিল না। রাস্তার ধারে ধারে আলো দিয়েছে, মোড়ে মোড়ে ফিরিওয়ালা ‘চাই গরম গরম বাখরখানি’ বলে হেঁকে যাচ্ছে। ওদের বাড়ি পৌঁছে বাড়ির মধ্যে খবর পাঠালাম।একটু পরে বীণা এসে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে—আপনার শরীর ভালো আছে?

—এক রকম মন্দ নয়। তোমার—তোমাদের সব?

বীণার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়লো। কথাটা জিজ্ঞাসা না করাই বোধ হয় উচিত ছিল। সান্ত্বনাসূচক গোটাকতক মামুলি কথা বলে আনাড়ির মতো বসে রইলাম। কিন্তু ঐ জন্যেই আমি বীণাকে ভারী পছন্দ করি—এত অল্পক্ষণের মধ্যে সে নিজের দুর্বলতাটুকু সামলে নিলে যে তাকে আমি মনে মনে সাধারণ মেয়েদের চেয়ে উচ্চ আসনে স্থান না দিয়ে পারলাম না।

চোখ মুছে নিয়ে বললে—আপনি এসে উঠেছেন কোথায়?ডাকবাংলোয়? আচ্ছা এইবার তো আমরা এসেছি, জিনিসপত্র নিয়ে এখানে চলে আসুন কাল সকালেই...

বীণ কথাটা এমন হুকুমের সুরে বললে যে হঠাৎ তার প্রতিবাদ করা সম্ভবপর নয়। অন্য কথা তুলে সেটা চাপা দেবার ভাবে নানা অনাবশ্যকীয় কথা ওঠালাম, যেন প্রধানতঃ সেইগুলো জানবার আগ্রহেই আমি এতটা পথ হেঁটে এসেছি; শেষে বললাম—প্রতিমা কোথায়?এ প্রশ্নটা অনেকবার মুখে এলেও এতক্ষণের মধ্যে কি জানি কেন একবারও মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারি নি।

বীণা বললে—দিনি এখনও সারে নি। বড় মামাবাবু সঙ্গে করে চুনার নিয়ে গেছেন,সেইখানেই আছে। কেবল আপন মনে বসে বসে কি ভাবে, এ ছাড়া তার আর কোনো খারাপ লক্ষণ নেই।কিছু খায় না দায় না, শুতেও চায় না, বেড়াতে যেতেও চায় না, কেবল রাতদিন বসে বসে ভাবছে—ঐ তার রোগ...

—পরীক্ষায় পাস না করেই বোধহয় এমন হয়ে...

বীণা বললে—শুধু পরীক্ষায় পাস নয়, সে অনেক কথা। আপনাকে বলতে আর কি, আপনি ঘরের লোক। দিদি পরীক্ষা দেওয়ার পর বাবা তার এক সম্বন্ধ ঠিক করলেন।চাঁটগাঁয়ের উকীল, হাতে পয়সা আছে, কিন্তু তেজপক্ষের বর, বয়স চল্লিসেরও ওপর। দিদি সব শুনেছিল, কিন্তু কিছু বলেনি। মা কত বোঝালেন কিন্তু বাবার ইদানীং কেমন হয়েছিল জানিনে, দিদিকে একেবারে যেন বিষ নজরে দেখতেন। দিদি শেষে রাগে পড়েখবরের কাগজ দেখে কোথাকার স্কুলে মাস্টারীর দরখাস্ত করে, চাকরি পায়ও—কিন্তু বাবার হাতে তাঁদের চিঠি এসে পড়ে। তারপর সে কী অপমান আর কী কাণ্ড! তারপরই পরীক্ষায় ফেল হোল, সে আবার এক কাণ্ড! বাবা হঠাৎ মারা না গেলে এ-বিয়ে ঠিক হোত।এইসব গোলমালে দিদি যেন কেমন হয়ে গেল।চিরকাল সে ভারী অভিমানী। দিদির কোন দোষ ছিল না, সে যে মাস্টারীর দরখাস্ত করেছিলসে শুধু অপমানের জ্বালায় জ্বলে জ্বলে আর থাকতে না পেরে।

তারপর বীণা আমায় বসতে বলে তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে পুরানো দিনের মতো নিজের হাতে চা ও ঝি-এর হাতে জলখাবারের রেকাবি আর জলের গ্লাস নিয়ে ঘরের টেবিলে রেখে বললে—আসুন দিকি, খেয়ে দেখুন তো চা'টা—তবে কি আরআপনার ডাকবাংলোর বাবুর্চির মত হয়েছে?

বীণা আগেকার চেয়েও সুশ্রী ও মাথায় বড় হয়ে উঠেছে। তবে ওর ধরনগুলো ঠিক আছে, একটুও বদলায়নি। বেশ লাগে ওকে।

ওঠবার সময় বীণা বললে—কিন্তু আপনি কাল সকালেই আসবেন তো? আমি মাকে বলেছি, আপনি না এলে ভারী রাগ করবো কিন্তু বলে দিচ্ছি। কাল রঘু মিশিরকে সকালে ডাকবাংলোয় পাঠিয়ে দেব এখন।

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম—এবারকার অফিসের কাজ শেষ হয়ে এসেছে, বেশীদিন আর ঢাকায় থাকতে হবে না, অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতায় যেতে হবে। বরং এর পর যখন আসবো—ইত্যাদি। বীণা কিন্তু কিছুতেই শুনলে না, তার মনেও বেশী কষ্ট দিতে পারলাম না, রাজী হয়ে বললাম—আচ্ছা তাই হবে, তবে একটু দেরী হয়ে যাবে হয়তো, এই বেলা ন'টার মধ্যেই আসবো। বীণা খুব খুশী হয়ে বললে—আপনার সেই ঘরটাতেই থাকবেন, সকালেই আটটার আগে আমি রঘু মিশিরকে পাঠাবো।চলেআসবার সময় আবার ডেকে বললে—সকালে চা খেয়ে আসবেন না যেন, এখানে এসে খাবেন...

ডাকবাংলোয় ফেরবার পথে সেদিন একটা সত্য আমার কাছে বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠলো—হঠাৎ বীণারা আমার বড় আপন হয়ে উঠেছে। এত অল্পদিনে যে উপকরণে গাঁথুনী পাকা ও শক্ত হয়ে ওঠে, ওদের দিক থেকে অন্ততঃ তার কোনো কার্পণ্য তো ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের এরকম সহজ সম্পর্ক আদান-প্রদান যে জীবনের কত বড় সম্পদ তা অনেক স্থলে আমরা বুঝিনে বলেই সকল সম্বন্ধকে ছোট করে দেখতে শিখি। মেয়েরা এটা কেমন সুন্দরভাবে পারে, ওদের চরিত্রগত সেবা-প্রবৃত্তি ও মুগ্ধ মনের সৌন্দর্য জগৎকে যে কত দিক থেকে মঙ্গল ও কল্যাণে ভরে রেখেছে তার বাস্তবতা সেদিন নির্জন ডাক-বাংলোর বারান্দাতে বসে মনেপ্রাণে অনুভব করলাম।

সব কথা বুঝিয়ে বলা যায় না। শুধু নক্ষত্রদল যখন অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে কাঁপে, রাত্রি অপূর্ব রহস্যময় হয়...নৈশ পাখীর ডাক দূর থেকে ভেসে আসে...মনের মধ্যের নাম-না-জানা উল্লাসে সে সত্যটুকু নিজের কাছে নিজে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।...

ডাকবাংলোয় ফিরে দেখি আমার এক পুরনো বন্ধু আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তিনি ইন্সিওরেন্সের দালাল, নারায়ণগঞ্জে কাজে এসেছেন এবং সেখানেই আছেন। তাঁর নামে তাঁর একটা মাণিঅর্ডার এসেছে,কিন্তু

সেখানকার পোস্টমাস্টার তাঁকে চেনেন না, তাঁকে সনাক্ত করবারও কেউ সেখানে নেই বলে টাকা দিচ্ছেন না : এদিকে তাঁর হাতেও এক পয়সা নেই—এখন কি করা যায়?

খুব ভোরের ট্রেনে বন্ধুকে নিয়ে নারায়ণগঞ্জে রওনা হলাম। যাবার সময় চৌকিদারকে বলে গেলাম কেউ এসে খোঁজ করলে বলতে যে জরুরী কাজে নারায়ণগঞ্জে চলে গিয়েছি, আজই ফিরবো।নারায়ণগঞ্জে কাটলো দিন দুই। মহা হাঙ্গামা! পোস্টমাস্টার আমাকেও চেনেন না, টাকাও কিছুতেই পাওয়া যায় না। দু'একজন যাদের সঙ্গে পূর্বে পরিচয় ছিল তাঁরা টাকাকড়ির হাঙ্গামা শুনে পেছিয়ে গেলেন। অনেক কষ্টে শেষে কাজ মিটলো। ডাক-বাংলোয় ফিরেই অফিসের চিঠি পেলাম, বিশেষ দরকারে কুমিল্লা যেতে হবে।চিঠি এসে দু'দিন পড়ে আছে, আগেই যাওয়া উচিত ছিল, বিলম্বে কার্যক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। ডাক-বাংলোর চাপরাশী বললে, রঘু মিশির দু'দিন এসে ফিরে গিয়েছে। এদিকে ট্রেনের সময় সংক্ষেপ, ফেরবার পথেই বীণার সঙ্গে দেখা করা ঠিক করলাম।

কুমিল্লা থেকে যেতে হোল চাটগাঁ, সেখান থেকে স্টীমারে বরিশাল, সেখান থেকে কলকাতা। তারপরেই ফাল্গুন মাসে আমার ছোট বোনের বিবাহ উপলক্ষে একমাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি। ছোট বোনের বিবাহ শেষ হয়ে যাবার অল্পদিন পরেই মা পড়লেন অসুখে এবং মাসখানেক ভোগবার পর চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সেরে উঠলেন, কিন্তু চেঞ্জে যাওয়ার দরকার হোল। অফিসে আরও একমাস ছুটির দরখাস্ত করাতে তারা ছুটি তো দিলেই না বরং লিখলে, শীঘ্র কাজে যোগ নাদিলে অন্য লোক বাহাল করবে। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এক লম্বা পত্র লিখলাম সেখানে।

তাই এতদিন পরে ভেবে দেখি জীবনের গতি অপূর্ব, অদ্ভুত। এর চেয়ে বড় রোমান্সের সন্ধান কেউ দিতে পারে না। বীণাকে যখন বলে আসি পরদিন সকালে তার ওখানে যাবো-- এমন কি তার মন প্রফুল্ল রাখবার জন্য তাকে কি সব বই পড়াবো তা পর্যন্ত ভাবতে ভাবতে এসেছিলাম—তখন কে জানতো বীণার সঙ্গে দেখা তো আর হবেই না, আমার ঢাকা যাওয়ার পথই একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।

তারপর কয়েক বছর কেটে গেল।আইন পাস করে আলিপুর কোর্টে বেরুতে আরম্ভ করলাম। ভবঘুরে জীবন ক্রমে পেছনে পড়ে গেল।মাত্র নির্জন অবসর-মুহূর্তে, বার-লাইব্রেরী কক্ষের মক্কেলহীন দুপুর বেলায় মাঝে মাঝে সে-সব দিনের নানা কথা মনে পড়ে—তখন যেন স্বপ্নের মত ঠেকে।...

এইসব স্মৃতিতে জীবন মধুময় হয়ে ওঠে, জীবনের কুঞ্জবনে এরাই গায়ক-পাখী, ফুল-ফলে সকাল দুপুরের সঙ্গে সুর-মেলানো অনন্তমুখী সঙ্গীত এদেরই নিভৃত নীড়ান্তরাল থেকে শোনা যায়।

বিবাহের অনুরোধে বাড়িতে তিষ্ঠানো দায়। জ্যাঠামশায় ভবানীপুরে কোথায় বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করে পাত্রী দেখে এসে খুব প্রশংসা করলেন। জ্যাঠাইমার অনুরোধে তাঁদের বাসা থেকে রওনা হয়ে বন্ধুবান্ধব সঙ্গে নিয়ে একদিন মেয়ে দেখতে গেলাম।

বেলতলা রোডে একতলা ছোট বাড়ি। বাড়ির সামনে ছোট্ট একটু কম্পাউণ্ড, গেটের ওপরকার লোহার জালতিতে থোকা থোকা মাধবীলতার গুচ্ছ। আমরা গিয়ে বৈঠকখানায় বসবার অল্পক্ষণ পরেই মেয়েকে আনা হোল। তার মুখের দিকে চেয়েই আমি চমকে উঠলাম। বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হোল না।

বীণা!...

কিন্তু এ কোন বীণা? চার বছর আগের সে চঞ্চলা বালিকা নয়, অনিন্দ্যসুন্দরী ধীরাসংযতা তরুণী! মেয়ের মামা পরিচয় দিলেন মেয়েটি বেথুনে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, ম্যাট্রিক ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছে, পড়াশুনায় বেশ ভাল; বাপ ঢাকার উকিল ছিলেন, মারা গিয়েছেন। বীণা চোখ নিচু করে ছিল, আমার দিকে চায় নি—সে বোধ হয় জানেও না যে আমিইপাত্র।

বাড়ির বার হয়ে এসে বন্ধুরা আমাকে ভাগ্যবান বললেন। ও-রকম পাত্রী অদৃষ্টে জোটা ইত্যাদি।

কাউকে কোন কথা বললাম না।

শুভদৃষ্টির সময় কাপড় ঢাকা দিয়ে দেওয়া হোল না, এমনই দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে দেখলাম—বীণার মুখের অবস্থা ফটোগ্রাফ নেবার যোগ্য হয়েছিল।

অনেক রাত্রে বাসরে সে শাসনের সুরে বললে—আপনি তো আচ্ছা? তলে তলে বুঝি এই সব কু-মতলব ছিল?

আমি উত্তর দিলাম—আমি বুঝি জানি? মেয়ে দেখবার দিন তো আমি জানলাম। আগে জানতে পারলে তুমি বোধ হয় এতে রাজী হতে না—না?

বীণা রাগে ঘাড় দুলিয়ে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলে। আমার দিকে না চেয়েই বললে— কোথায় ছিলেন এতদিন নিরুদ্দেশ হয়ে?আর এলেন না কেন সেবার?

সংক্ষেপে কৈফিয়ত দেবার পর আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করলাম—প্রতিমাকে দেখছি না, সে কি এখানে আসে নি আজ?

এবার বীণা আমার মুখের দিকে চাইলে, চেয়ে চুপ করে রইলো।তারপর সংযত সুরে বললে—জানেন না? দিদি নেই—সেবারই মাঘ মাসে মারা যায়। মাথা তার ভাল হয় নি। আপনার নাম বড় করতো আমার কাছে, কতদিন বলেছে।